OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 132 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 132 - 139
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মার্কসবাদী সাহিত্য বিশ্লেষণের আঙ্গিকে মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত গল্প

তন্ময় সরদার
সহকারী অধ্যাপক
দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, হরিরামপুর
Email ID: tanmaysardar2014@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Marginal, Deprived people, society, Superstructure. economic foundations, Capitalist.

Abstract
One approach to literary criticism is the Marxist approach. Mahashweta Devi's story has a deep meaning for the marginal people of the society. Society, state, politics, economy, history, mythology are connected with Tsar. He has written about the people who are completely neglected in the society by keeping various historical events in accordance with the facts. Social and economic status of those people. Some stories of Mahasweta Devi have been analysed from a Marxist point of view. In Marxist theory, the economic structure controls society's politics, law, art, religion, values, etc. These are superstitions in Marxist terms. The state enacts certain laws so that the economic structure established in the society remains unchanged. Literature is part of this superstructure. So Marxism focuses on how this view is expressed in literature. In Mahasweta Devi's Jaswanti story, how did the feudal society affect the characters, the society? It has been seen. On the other hand, the role of the state towards the proletarian people is shown in the story of Draupadi. It has been proposed to take up the issue of how deforestation under the aggressive influence of capitalist civilization endangers human and animal life and promotes profit or capitalistic civilization. In general, Marxism has given importance to the relationship between history, economy and social state in literary criticism. In this article, some stories of Mahasweta Devi have been analysed in that way.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় মহাশ্বেতা দেবীর ভূমিকা অভিনব ও স্বতন্ত্র। কারণ তিনি পূর্ববর্তী লেখিকা যেমন আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখদের রচনায় উল্লেখিত সমসাময়িক সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাতে যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, পারিবারিক নর-নারীর ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রবৃত্তিগুলোকে অতিক্রমণ করে বলেছেন– 'The voiceless section of Indian Society'-র কথা। যারা প্রথাগত শিক্ষায় ততটা শিক্ষিতই শুধু নয়, ভারতীয় সমাজব্যবস্থার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 132 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মূল ধারা থেকে যারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতবর্ষকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যাদের না জানলে। সেই মানুষগুলোর কথা প্রকাশের দায়বদ্ধবতায় তাঁকে বাংলা সাহিত্যে লেখক-লেখিকার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে তুলেছে। মহাশ্বেতা দেবীর এই বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যতার কথা বলতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সাধারণত নারীর জীবনবীক্ষণে যে একটি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা দেখা যায়, পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচিতি ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি একান্ত ও অব্যবহিত মনোযোগ লক্ষিত হয়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য তাহাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া নানা নতূন পথে, অভিজ্ঞতার অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়াছেন নানা অপরিচিত জীবনযাত্রার ধারা আমাদের নিকট উদ্ঘাটন করিয়াছেন।"[১]

সেই কারণে হাজার চুরাশির মা, অরণ্যের অধিকার, চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর ইত্যাদি উপন্যাস ও দ্রৌপদী, স্তন্যদায়িনী, ভাত ইত্যাদি ছোটগল্পগুলোর মতো বাস্তবধর্মী, ভিন্ন বিষয়ের আস্বাদ আমরা পেয়ে থাকি। যেকোনো সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত থাকে সমাজবাস্তবতা। কারণ বাস্তবতাই লেখকের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে সেই অভিজ্ঞতারই শৈল্পিক প্রকাশ সাহিত্য। সাহিত্যের দাবি ও জীবনের দাবি এক হয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবী জীবনের সত্যকে সাহিত্যে প্রকাশে বিশ্বাসী, কারণ তিনি শিল্পের জন্য শিল্প করার ইচ্ছে বা সাধকে ধারণ করেননি। স্বাধীনতা অর্জনের ত্রিশবছর পরেও অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখেননি। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

> "যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।"[২]

সুতরাং লেখিকা সমাজ জীবনের এই বাস্তব সত্যকেই তাঁর সাহিত্যে প্রকাশে বদ্ধ পরিকর। ঐতিহাসিক, লেখক – জীবনী ভিত্তিক, নারীবাদী, সংরূপগত, শৈলীগত এরকম নানা পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনার প্রেক্ষিতেই সাহিত্য বিশ্লেষণ করা যায় ঠিকই তবে মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় উপেক্ষিত সামাজিক – রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত সর্বহারা মানুষের কথা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এমন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে যে তা স্বাভাবিক ভাবেই মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনার ভাবনা উস্কে দেয়। বিশেষত লেখিকা নিজেই যখন সর্বহারা মানুষগুলোর কথা প্রকাশে তাঁর দায়বদ্ধতার কথা বলেন, নিরন্তর ইতিহাস চর্চার কথা বলেন এবং আরও বলেন—

> "সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্যবিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনো লেখকেরই মূল্যায়ন করা যায় না।"[৩]

যদিও মার্কসবাদ সাহিত্য সমালোচনার নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি নির্ধারণ করে যায় না, তৎসত্ত্বেও সাহিত্য নিয়ে তাঁদের নানা মন্তব্যে সাহিত্যকে ব্যাখ্যার কিছু নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করে। তারই নিরিখে মহাশ্বেতা দেবীর রচিত কিছু গল্পের মুল্যায়ন আমাদের উদ্দেশ্য।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলোর মধ্যে মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পূর্বে এই মতাধারার সাহিত্য কেন্দ্রিক প্রসঙ্গগুলোর আলোচনা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য এই সাহিত্য সমালোচনা শুধুমাত্র অর্থনীতিকেই সাহিত্যের মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভাবে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস, উৎপাদন ব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সাহিত্য সমালোচনা পূর্বে হলেও মার্কসীয় সমালোচনায় বলা হয় সাহিত্যের অঙ্গিক, শৈলী, অর্থ, একটি ইতিহাসের ফল শুধু নয় প্রতিটি শিল্পেই থাকে তার সমকালের ঐতিহাসিক যুগের প্রতিচ্ছায়া এবং সাহিত্যের সমালোচনা অনুসন্ধান করা উচিত সেই ইতিহাসের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নিরিখে। সমাজ পরিবর্তনের প্রতি স্তরেই থাকে অর্থনৈতিক কাঠামো বা Base। যেটি তৈরি হয় উৎপাদনের শক্তি ও সম্পর্কের ভিত্তিতে। যেমন, মধ্যযুগে শ্রমসংগঠন দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্পর্ক যা গড়ে তুলেছিল সামন্ততন্ত্র। তার পরবর্তী স্তরে পুজিপতি শ্রেণীর মানুষেরা সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের শ্রমকে উৎপাদক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে গড়ে তুলেছিল অন্য একটি অর্থনৈতিক কাঠামো। এই অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে তৈরি হয় উপরিসৌধ বা Super – structure। এই উপরিসৌধতেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্মীয়ভাবনা, নৈতিকবোধ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি। এখানে রাষ্ট্র সর্বদায় সমাজের মালিক শ্রেণি বা পুঁজিপতিদের ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নের দ্বারা সমর্থন করে যায়। অন্যদিকে উৎপাদক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 132 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শক্তির যাদের শ্রমশক্তিতে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক ভিত্তি তারা বরাবর সেই রাষ্ট্রীয় শোষণ ব্যবস্থার দ্বারা নিষ্পেষিত হয়। সুতরাং সাহিত্য যেহেতু সমাজের উপরিসৌধের অংশ তাই সাহিত্যকে বিশ্লেষণে সেই সমগ্র সামাজিক কাঠামোটিকে অনুসন্ধানের প্রয়োজন। যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে রাষ্ট্র, রাজনীতি, নৈতিকতা বোধ ইত্যাদি আরোও সব উপরিসৌধের উপাদানগুলো। যেগুলো প্রত্যক্ষ - পরোক্ষ ভাবে নির্ভর করে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর। তবে এই এটাও ঠিক যে, অর্থনীতির দ্বারা উপরিসৌধের সকল উপাদানকে বর্ণনা করা যায় না, তবুও মার্কসবাদ এটাই প্রতিষ্ঠা করে যেকোন শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারাই শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থে লেখক টেরি ঈগলটন সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে টি.এস. এলিয়ট এর The West Land কাব্যের মার্কসবাদী বিচারকে উল্লেখে করে বলেছেন যে—

> "কবিতাটি সরাসরি মতাদর্শগত এবং অর্থনৈতিক কায়েকটি কারণের কারণের দ্বারা নির্দিষ্ট – সেগুলি হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নামক ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের যে সংকট, তার ফলে উদ্ভূত বুর্জোয়া মতাদর্শের অবক্ষয় ও আধ্যাত্মিক শূন্যতা।"[৪]

আবার শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়াতেই মার্কসবাদী পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ হয় না। এর সঙ্গে প্রাবন্ধিকের বক্তব্যটি উল্লেখ করা যায়—

> "সেটি হল, সব ক'টি উপাদান, যেগুলো আমি উল্লেখ করেছি (লেখকের শ্রেনী-অবস্থান, মতাদর্শের বিভিন্ন ধারণ এবং সাহিত্যের বিভিন্ন ধরণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, 'আধ্যাত্মিকতা' ও দর্শন, সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন কলাকৌশল, নান্দনিক তত্ত্ব), সরাসরি ভাবে ভিত্তি উপরিসৌধ মডেলটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসীয় সমালোচনার অন্বিষ্ট এই সকল উপাদানের সেই মৌলিক সমাবেশ, যেটি 'দি ওয়েষ্টল্যান্ড' নামে আমাদের কাছে পরিচিত।"[৫]

মার্কসবাদ সাহিত্য সমালোচনায় আঙ্গিক সর্বস্বতার বিরোধিতা করে। তারা মনে করে অন্তরবস্তুর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ না হলে আঙ্গিক সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। তবে তাঁরা এটাও মনে করতেন—

> "শিল্পের আঙ্গিক ব্যক্তিশিল্পীর নিছক খেয়ালের ব্যাপার নয়। যে অন্তরবস্তুকে তাকে আশ্রয় করতে হবে তার দ্বারা আঙ্গিক ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট হয়।"[৬]

তবে সামাজিক পরিবর্তনে লেখকের মতাদর্শের বিবর্তনে আঙ্গিক বদলে যায়। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডে উপন্যাসের আবির্ভাবের বিষয়টির উল্লেখ করে আয়ান ওয়াট 'দি রাইজ অব দি নভেল' বইতে বলেছেন উপন্যাসের অন্তরবস্তু যাই থাকুক আঙ্গিকের দিক থেকে একটি মিল লক্ষ্য করা যায় যে, রোমান্টিকতা অলৌকিকতা থকে লেখকদের ব্যক্তিমানস ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা নির্ভর কাহিনী রচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ভিক্টোরিয়ান পর্বের অভিজাততান্ত্রিক মূল্যবোধকে সংকটের সম্মুখীন করে তুলছে। তাই মার্ক্সবাদীরা মনে করেন সাহিত্যের আঙ্গিক সামাজিক নানা পরিবর্তনে ও লেখকের মতাদর্শের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়।

মার্কসীয় সমালোচনায় সর্বহারা মানুষের প্রতি লেখকদের শৈল্পিক কর্মের দায়বদ্ধতার কথা বলেন। বিপ্লব পরবর্তীতে রাশিয়ায় তৈরি হওয়া 'প্রোলেৎকুলৎ' শিল্প-সাহিত্যকে শ্রেণি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে সর্বহারাদের জন্য স্বতন্ত্র শিল্পের কথা বলেছিলেন। যে সর্বহারা শিল্পের প্রধান কাজ ছিল শ্রমিক শ্রেণীর ধ্যানধারণা ও অনুভূতিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের লক্ষ্যে চালিত না করে যৌথ চিন্তাদর্শনমুখী করে তোলা। কোন লেখকের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার পক্ষপাতিত্বকে অস্বীকার না করলেও মার্কস-এঙ্গেলস সাহিত্যে প্রাকাশ্য রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রয়োজনকে কম মূল্য দিয়ে মনে করেন—

> "লেখকের তাঁর রচনার উপরে নিজের রাজনৈতিক মত চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি কোন পরিস্থিতিতে প্রকৃত ও সম্ভাব্য শক্তিসমূহ যেভাবে কাজ করছে তাঁকে বিষয়গতভাবে যদি প্রকাশ করেন, তাহলে সেখানেই তিনি এক অর্থে পক্ষপাতী।"[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 132 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই পক্ষপাতের ভাবনা থেকেই সাহিত্য যে বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে এই ধারণা থেকে প্রশ্ন আসে, সাহিত্যে বাস্তব কি একেবারে আয়নার মতোই অপরিবর্তিত ভাবে প্রতিফলিত হয়? এটি নিয়ে মাশরী, লুকাচ, ট্রটস্কি প্রমুখ মার্কসবাদী সমালোচকরা নানা ভাবেই তাদের মতামত দিয়েছেন, যাতে বোঝা যায় সাহিত্য বাস্তবের অবিকল প্রতিফলন নয়, শৈল্পিক যেকোন সৃষ্টি "শিল্পের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী বাস্তবতার এক গতিপরিবর্তন ও রূপান্তর। শিল্প অভিজ্ঞতাকে অদ্ভুদ ভাবে পাল্টায়।"[৮] তাঁরা আরও মনে করে, সাহিত্য প্রকৃত বস্তু থেকে যতদূরে যাবে তত প্রকৃত অনুসরণ করবে সাহিত্য মূলত প্যারডির ধর্ম সম্পন্ন। আসলে মার্কসবাদী মহলে নন্দন তত্ত্বের আলোচনায় একমুখী 'প্রতিফলন' তত্ত্ব প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীতে লেখক, শিল্পীদের সৃজনীশক্তি কল্পনা শক্তি পরবর্তীতে প্রাধান্য পায়। মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনার আরও জটিল আলোচনাই অবশিষ্ট থেকে যায়, তবে এই দর্শনের এই সীমিত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা মহাশ্বেতা দেবীর কিছু গল্পের স্বরূপ বিশ্লেষণে অগ্রসর হবো।

'যশবন্তী' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। কিন্তু গল্পের আখ্যান বিশবছর পূর্বের। কাজেই গল্পের আখানবস্তু মূলত ১৯৪০ সালের কাছাকাছি। এই সময়কালে রাজস্থানী এক রাজপুত পরিবারের সংস্কৃতি, দাম্পত্য সম্পর্ক ও সামাজিক অবস্থানের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যার মূলচরিত্র নবল ও তাঁর স্ত্রী যশবন্তী। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার অন্তিম পর্বে গোটা ভারতবর্ষে জমিদারী প্রথার সূর্যাস্ত হলেও রাজস্থানে জমিদারী জায়গীরদারি প্রথা অত্যন্ত শক্তিশালী ভাবেই বিদ্যমান ছিল। কারণ রাজস্থান সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কতকগুলো দেশীয় রাজ্যের সমষ্টি হিসেবে একত্রে 'রাজপুতনা' নামে পরিচিত ছিল। যেগুলোতে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রচলন ছিল। এই রাজকীয় ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রশাসন হস্তক্ষেপও করতেন না। কারণ তাঁদের লক্ষ্য ছিল নির্বিঘ্নে রাজস্ব আদায় করা। ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে জমিদারী ব্যবস্থা এখানে কার্যকারী ছিল। ঐতিহাসিক এই পটভূমিকায় আমাদের বুঝতে হবে এই গল্পের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোটিকে। মূল আখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে হিরনিয়া নামক একটি স্টেশনে এক্সরে মেশিনের বিক্রেতা সেন সাহেবের সঙ্গে ডাক্তার মালহোত্রার মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমিদার ও প্রজার মধ্যে থাকে মূলত উৎপাদক শক্তির সম্পর্ক। প্রজাদের শ্রমকে আত্মসাৎ করে গড়ে ওঠে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক হিসেবে ব্রিটিশ প্রসাশনের সাহযোগিতায় জমিদার ও প্রজাদের এই শোষণ প্রক্রিয়াটি সচল থকে যায়। শুধু তাই নয়, নানা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগুলো যা আসলে মার্কসবাদী সমালোচনায় উপরিসৌধ হিসেবে চিহ্নিত হয় সেগুলোও অর্থনৈতিক এই কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গল্পে নবলের বংশ পরিবার আসলে শ্যামগড়ের প্রজা। ওকালতিকে পেশা করে তাঁর পিতা যথেষ্ট সম্পদ অর্জন করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে ছেলেকেও উকিল করে আরও অধিক অর্থ উপার্জনের করতে। এ কারণে কলেজের শিক্ষা গ্রহণও শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার আগেই বছর তেরো হতেই নবলের বিবাহ সম্পূর্ণ হয় যশবন্তীর সঙ্গে। তাঁদের বিবাহ প্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন—

> "যশবন্তীর বাবা কুলে - সন্মানে বড়ো। শিশোদিয়া ঘরের রক্ত আছে শরীরে। অবিশ্যি পয়সার সচ্ছলতা তাঁর নেই। নবলের বাবা বংশমর্যাদায় সমকক্ষ নন বৈবাহিকের। তবু তিনি মানী ঘরের ছেলে। তাছাড়া তিনি জয়পুরের পাশকরা উকিল। ...কাআজেই নবলের বাবা সহজেই পয়সা কামাতে লাগলেন। জমি হল, মোষ কিনলেন, ইঁদারা দিলেন বাপ-মায়ের নামে ...বংশমর্যাদায় যেটুকু কমতি ছিল, যশবন্তীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে সেটা কায়েম করলেন।"[৯]

এখানে বংশমর্যাদা ও ওকালতি করে অর্জিত অর্থ সম্পদ এর প্রসঙ্গে একটি গুরুতর সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। সেটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জাত-পাত ও বংশগরিমার মূল্য কমে যেতে থাকে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় ফলে। ফলে জাত কৌলিন্য অপেক্ষা অর্থকৌলিন্য সামজে বৃদ্ধি পায়। তবে বংশ গরিমার আকর্ষণ একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, ছেলের বিবাহের দ্বারা নবলের বাবা তা পূর্ণ করেছিলেন। আসলে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রভাব ভারতবর্ষের সকল স্থানেই পড়েছে এটি স্বাভাবিক। ফলে নবল চরিত্রটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা এই দুয়ের দ্বারাই প্রভাবিত বলে আমাদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 132 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনে হয়। তাই ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় ওকালতি, দালালি করে গড়ে ওঠা 'হঠাৎ বাবু'দের মতো শিক্ষিত, বিলাসী। তাঁর বৈবাহিক অনুষ্ঠানের জাঁকজমক পূর্ণ আয়োজন গল্পকার সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন—

> "সন্ধ্যেবেলা আতশবাজি পুড়িয়ে, বোমা ফুটিয়ে পালকিতে বৌ বসিয়ে নিয়ে এল নবল।"[১০]

নবল যশবন্তীর দাম্পত্য জীবনে সমস্যার সূত্রপাত হয় শ্যামগড়ের কুয়ার সাহেব বনবীর সিং এর আগমনে। যাদের সঙ্গে নবলদের জমিদার - প্রজার সম্পর্ক। সামন্ততান্ত্রিক ভাবনায় প্রজার শ্রম, জমি, পরিবার, স্ত্রী সকল কিছুর মধ্যেও জমিদার এর অধিকার কায়েম রাখা একেবারে স্বাভাবিক। অন্যদিকে রাজপরিবারের সঙ্গে যোগাযোগে সন্তানের জন্ম দেওয়াটিও সমাজের চোখে গর্বের বলে মনে করা হত। মার্কসীয় ধারণায় অর্থনীতি মানুষের মূল্য, সংস্কৃতি মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক ভাবেও প্রজাবর্গের কোন নারী রাজপরিবার বা জমিদারের দ্বারা সাময়িক গ্রহণেও গর্বের বলে মনে করে। রাজস্থানের জয়পুরের নবল - যশবন্তী গ্রামে সেই ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে কুয়ার সাহেবের ব্যবহারে—

> "যশবন্তীকে খুব ভালো লেগেছে তাঁর আর তখন পর্যন্ত, কি জানেন, রাজোয়ারা ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া, আর সন্তান হওয়া খুব একটা বেনজির নয়। এইসব সন্তানদের বলা হয় ক্ষেত্রজ পুত্র আর তার ফলে মেয়েটির পতিকূলে উচ্চ সন্মান পায়।"[১১]

বৃদ্ধ ঠাকুর সাহেবের প্রাথমিক আপত্তি থাকলেও যশবন্তীকে কুয়ার সাহেবের তুলে নিয়ে গিয়ে যখন বাড়ির সামনে রেখে দেয় তখন তিনি সামজিক সন্মানের কথা ভেবে গর্ব অনুভব করেন। আর সামাজের দৃষ্টিতে—

> "একটি জান্তব কৌতূহলে নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো মেয়েরা। বৌ-রা জিজ্ঞেস করল রাজাসাহেবের ঘরকন্না কীরকম?"[১২]

অর্থনীতিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত হয়েছে গ্রামের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ও নিয়ম কানুন। কিন্তু নবল। পূর্বেই বলা হয়েছে ঔপনিবেশিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত সে। কলেজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারাকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সে নিতে পারেনি। তার পিতা, কুয়ার সাহবের প্রতি তাঁর প্রতিবাদকে উজার করে দিয়েছে। এমনকি তাঁর স্ত্রীর প্রতি তাঁর অকারনে ক্ষোভের কারণে আত্মপীড়ন, আত্মনিগ্রহে নিজের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। পরবর্তীতে কুয়ারসাহবের যশবন্তীকে বিস্মৃতিই নবল ও যশবন্তীর দাম্পত্য জীবনের হারানো সুখ ফিরে এসেছে। গল্পের নাম যশবন্তী হলেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রজা নবলের প্রতিবাদ, মানসিক দ্বন্দ্ব সংকটই এই গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে।

জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের প্রতিবাদ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে লিখিত হয়েছে 'দ্রৌপদী' গল্পটি। যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। প্রথমেই বলাবাহুল্য নকশাল আন্দোলন সমর্থন বা অসমর্থনের প্রশ্নটি নয় প্রাধান্য পেয়েছে অর্থনৈতিক বঞ্চনা, শোষণের শিকার হওয়া সর্বহারা আদিবাসী কৃষকদের জীবন সমস্যাটি। নারী-পুরুষের অন্নবস্ত্রের অভাব ও চূড়ান্ত দারিদ্রের প্রশ্নটি। জমিকে অবলম্বন করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল তাতে শ্রম ছিল সাধারণ মানুষের কাছে আর মূল জমির অধিকার বর্তায় জমিদার ও জোতদারদের হাতে। ১৭৯৩ এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্থায়ী জমিদার এর উদ্ভব ঘটে। যারা নিজেদের ও ব্রিটিশ সরকারের কোষাগারের উদরপূর্তির জন্য কৃষকদের অতিরিক্ত কর আদায় করতেন অন্যদিকে জোতদার যারা প্রকৃতপক্ষে ধনী কৃষক বা মধ্যস্বত্বভোগী যারা আদিবাসী প্রান্তিক কৃষকদের ন্যূনতম প্রাপ্যটুকু না দিয়ে প্রায় সমস্তই অধিগ্রহণ করে নিতেন মিথ্যে মামলা জুয়াচুরির মারফতে। এই সীমাহীন অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে, সামন্তান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সর্বহারা মানুষের বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে দোপদি মেঝেন ও স্বামী দুলন মাঝির মধ্যে। গল্পের শুরুতেই মোস্ট ওয়ান্টেড হিসেবে চিহ্নিত এই দুই সাঁওতালের গ্রেপ্তারী ঘোষণা নামার প্রেক্ষিতে জানা যায়—

> "বস্তুত এরাই মেইন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরা মেইন।"[১৩]

তাই এই দুর্ধর্ষ অপরাধীরা সমুলে নিষ্কাশনে নিয়োজিত হয়েছে ভারতীয় সেনা বা রাষ্ট্র। যারা মনে করে আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধকারী এই আদিম আদিবাসীদের নিধন পবিত্র কর্ম। তাই ঝাড়খানী জঙ্গলে চলছে দোপদি খোঁজার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 132 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অপারেশন। সূর্য সাউ জোতদার মহাজন। জমির প্রকৃত মালিকানা নিজেদের হাতে রেখেছে, বীরভূমের প্রচণ্ড খরায় বিডিওর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজের বাড়িতে টিউবওয়েল, কুয়োর ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে ভূমিহীন আদিবাসী কৃষকদের চাষের জল ট্যাক্সের বিনিময়ে নিতে হবে। সেই টাকা পূরণ করতে না পারলে ধান, বাড়ি সবকিছুই অধিগ্রহণ করে নেবে। সাধারণ আদিবাসী চাষি দ্রৌপদি জোতদারকে বলেছে—

> "যাও যাও। তোমাদের পঞ্চায়েতী বদমাশি আমি মানি না। জল নিয়ে চাষ বাড়াবো। আধা ধান আধিয়ার লিবে। উনো ধানে সবাই বশ। তখন ধান দাও, টাকা দাও।"[১৪]

প্রচণ্ড খরায় জল থেকেও বঞ্চিত হয়ে তাঁরা এই জোতদারকে খুন করে—

> "গ্রামের সতীশ – যুগল - সেই বাবু ছেলেটা, বুঝি রানা তার নাম, তারা বলল। জোতদার মহাজন কিছু দিবে না, খতম কর।"[১৫]

বোঝা যায় জোতদাররা দরিদ্র চাষিদের শ্রম, অর্থ লুণ্ঠন করে অর্থনৈতিক শোষণের যে লাভজনক কাঠামো তৈরি করে ছিল দ্রৌপদির মতো সর্বহারা শ্রেণীর মানুষেরা তারই বিপক্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মার্কসবাদী ধারণায় অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতি, আইন, প্রশাসন, রাষ্ট্র। দ্রৌপদীদের সমস্যা রাষ্ট্রের কাছে আইন-শৃঙ্খলার বিধিভঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তাঁদের নিধনকর্ম সাধিত হয়—

> "ঝাড়খানী জঙ্গলে বেলটে অপরাশন চলছে – চলছে - চলবে। ওটি প্রসাশনের নিতম্বে দুষ্ট ফোড়া। সিদ্ধ মলমে সারবার নয়, তোকমারিতে ফাটবার নয়।"[১৬]

গল্পের শেষে দৌপদী ধরা পড়ে এবং ধর্ষিতা হন। নিজেকে বিবস্ত্র করে সেনানায়কের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—

> "লেংটা করতে পারিস, কাপড় প্রাবি কেমন করে? মরদ তু?"[১৭]

গল্পের নামটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। মহাভারতে রাজসভায় দ্রৌপদী লাঞ্ছিত হয়েছিলেন সকল রাজপুরুষদের মাঝখানে এখানেও দ্রৌপদী বিবস্ত্র হয়ে সাহসী প্রশ্ন যা আসলে এক প্রতিবাদ ছুঁড়ে দিয়েছে রাষ্ট্রের সেনানায়কের সামনে –

> "আর কী করবী? লেঃ কাউটার কর লেঃ কাউটার কর? দ্রৌপদী দুই মরদিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিবস্ত্র টার্গেটর সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[১৮]

অরণ্যকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে আরণ্যকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক পর্বের প্রথম দিকে যে আইন কানুন হয়েছিল তাতে অরণ্যচারী আদিবাসী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের বন্যসম্পদের অধিকার। রেলের বিস্তার ও জাহাজ তৈরির প্রয়োজনে অরণ্যচ্ছেদন বৃদ্ধি পায়। অরণ্যবাসী মানুষ ও পশু উভয়েরই সংকট বৃদ্ধি পায় ১৯২৭ সালের অরণ্য আইনে। স্বাধীনতার পরবর্তীতেও পরিবেশের ভারসাম্য ও অরণ্যবাসীদের জীবনজীবিকা রক্ষার জন্য একাধিক আইন প্রণয়ন হলেও শিল্প ব্যবসা বানিজ্যের প্রসঙ্গটিই সর্বাংশে প্রাধান্য পেল। ফলত আদিবাসী মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়েরই 'সংরক্ষণ' এর ব্যাপারটি পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দ্বারা বরংবার প্রতিহত হয়েছে। এবং এই মানুষ ও প্রাণী যে চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে তার বর্ণনা আছে মহাশ্বেতা দেবীর 'সংরক্ষণ' গল্পের মধ্যে। মারকান্দা জঙ্গল থেকে আষাঢ়া জঙ্গল পর্যন্ত হস্তিযূথের দীর্ঘ যাত্রা। যে যাত্রাপথে সরস, সজীব পাতা, ধান ইত্যাদি খাদ্য আহার করে, বর্ষার জলে বিহার করে, শিশুর জন্ম দেয় এবং শেষে আবার ফিরে যায় মারকান্দা জঙ্গলে। এই যাত্রায় যুগ যুগ ধরে অরণ্যবাসী শবরের আন্তরিক অভ্যর্থনায়, পুজায় এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব তৈরি হয়েগেছে এই মানুষ ও পশুগুলোর মধ্যে। কিন্তু এবারের যাত্রা একেবারেই ব্যতিক্রম যূথপতীর কাছে। সে খুঁজে পাচ্ছে না তার চেনা গন্ধ, শুনতে পাচ্ছে গাছ কাটার আওয়াজ, ট্রাকের আওয়াজ, জলে পায় তেল কুচকুচে দুর্গন্ধ। কিন্তু সে আশা রাখে আরও এগিয়ে গেলে নিশ্চয় পাবে তার চেনা পৃথিবীকে—

> "পর পর ট্রাক ছলে যাচ্ছে সগর্জনে, অরণ্যের শব বহন করে। হাতি দেখে শঙ্কাতুর ভীত ট্রাকগুলি ভীমবেগে ধায় এবং যূথপতি শুঁড় উপরে তোলে। তার সঙ্গীরা এই অচেনা সঙ্কটে পড়লে কী করবে? আছে, অরণ্য আছে, পথের ওপারে থাকবে। সে এগিয়ে চলে...।"[১৯]

অথচ সে জানেনা তার পথে অপেক্ষা করে থাকে পুঁজিবাদ ও যন্ত্র সভ্যতার কাণ্ডারিরা বন্দুক হাতে হাতির দাঁতের বিক্রির জন্য মহীন্দর চোলাদারের মতো মানুষেরা বলে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 132 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "বন্দুকের সামনে হাতি কী? একটা পাকা দাঁতের দাম জানো?"[২০]

অন্যদিকে সেপাইরাম ভক্তাও এই অরণ্যের সংকটে বিপন্নতাবোধ করেছে। সেপাইরাম ও তার পিতা মড়িরাম ভক্তা দীর্ঘ পরম্পরায় নানা কারণে জেল খেটেছে। কারণ অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল মানুষগুলোকে বাবুরা প্রশাসনের সহযোগিতায় খুব সহজেই ইচ্ছে মতো কাজে লাগাতে পারতো। পুলিশ ও ও সামাজের এই 'বাবু'দের মধ্যে ভূমিকা এখানে অভিন্ন। বৃদ্ধ শবর সেপাইরামের স্বপ্নে কালকেতুর পুরাকথার প্রসঙ্গ এনেছেন গল্পকার। ক্ষমতাহীন, দরিদ্র আদিবাসী মানুষগুলোর একটি ইতিহাস ও আশ্রয়কে আসলে এখানে গল্পকার নির্মাণ করতে চেয়েছেন। যে পুরাণ আপমানের নয় গর্বের, জয়ের এবং আশার। কাল্কেতু আসলেই 'স্বর্ণগোধা' মিলবে। মুক্তি ঘটবে দারিদ্রতা থেকে শোষণ থেকে। অরণ্যের স্নেহকোলের খোঁজে গৃহ ত্যাগ করে আষাঢ়ার জঙ্গলে প্রবেশ করে বিস্মিত সেপাই লক্ষ্য করে—

> "নাই, অরণ্যে ফেরা এক লোধাকে বনাঞ্চলে ঢেকে নেবে এমন গাছ নেই।"[২১]

বন্যপ্রাণী ও অরণ্যবাসী মানুষের পুরনো সখ্যতা ভেঙ্গে গিয়ে যূথপতির আঘাতে সেপাইরামের মৃত্যুই আসলে এই গল্পের ট্রাজেডি। যা ঘটলো মূলত পুঁজিবাদী, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসী প্রসার ও অরণ্যচ্ছেদন। যাদের কাছে অরণ্যবাসী মানুষের জীবন জীবিকা, পশুদের জীবনধারা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য অপেক্ষা মুনাফা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। গুলির আঘাতে যূথপতির মৃত্যু ঘটে। সংবাদপত্রও নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতার রাষ্ট্রের দ্বারা। গল্পকার দেখিয়েছেন সেপাইরাম ও হাতির মৃত্যুর প্রকৃত কারণের অনুসন্ধানে গিয়ে ভিন্ন ভাবেই ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অরণ্য কেটে পুঁজিবাদের মূলধন বিনিয়োগের পথ খুলে দেওয়া হয়—

> "আষাঢ়ার সংরক্ষিত বনে এক পাগল হাতি নিহত। আষাঢ়া শীঘ্রই সরকারি পর্যটনকেন্দ্র ও পিকনিক স্টট হবে। হাতি কর্তৃক নিহিত নিলামচন্দ্র খিলারি বনরক্ষীর পরিবার পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে।"[২২]

সরকারি কর্মী না হওয়ায়, সাধারন আদিবাসী সেপাইরামের পরিবার বঞ্চিত থাকে। অর্থনৈতিক ভিত্তি কিভাবে রাষ্ট্র, সময়, আইনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই গল্পে সেটি স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখিত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় ভারতবর্ষের প্রান্তিক মানবজীবনের আখ্যান চিত্রিত হয়েছে ইতিহাস, পুরাকথা ও তথ্যনিষ্ঠ ভঙ্গিমায়, সমাজবাস্তবতার এমন নিটোল বর্ণনার সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে অধিক নয়। তাঁর প্রতিটি লেখাতেই রাজনীতি, রাষ্ট্র, অর্থনীতির প্রসঙ্গ অত্যন্ত স্পষ্ট। মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা আদতে জটিল ও বহুমুখী। সেই জটিলতায় না গিয়ে সরল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু গল্পকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মার্কসবাদী সমালোচনারও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। অর্থনৈতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিলেও অনালোচিত থাকে সাহিত্যের অনেককিছুই। তবে মার্কসবাদ সাহিত্য বা শিল্পের একটি স্বতন্ত্র সৃজন সত্তাকে অস্বীকার করতে পারেনি। সেও শিল্পসত্তার বিচারেও মহাশ্বেতা দেবী একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখিকা এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার, ২০১২-২০১৩, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, মডার্ন বুক এজেন্সী, পৃ. ২১৩
২. দেবী, মহাশ্বেতা, মার্চ, ২০১৯, শ্রেষ্ঠগল্প, ভূমিকা, গুপ্ত, অজয়, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, দেজ, পৃ. ১০
৩. তদেব, পৃ. ১০
৪. ঈগলট্ টেরী, জুলাই, ২০০৮, মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা, কলকাতা - ৭০০০০৯, দীপায়ন, পৃ. ৩১
৫. তদেব, পৃ. ৩৩
৬. তদেব, পৃ. ৪২
৭. তদেব, পৃ. ৭৩
৮. তদেব, পৃ. ৭৮

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 132 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৯. দেবী, মহাশ্বেতা, মার্চ, ২০১৯, শ্রেষ্ঠগল্প, যশবন্তী, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, দেজ, পৃ. ১৭
১০. তদেব, পৃ. ১৭
১১. তদেব, পৃ. ১৯
১২. তদেব, পৃ. ২০
১৩. দেবী, মহাশ্বেতা, মার্চ, ২০১৯, শ্রেষ্ঠগল্প, দ্রৌপদী, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, দেজ, পৃ. ৬১
১৪. তদেব, পৃ. ৬৭
১৫ তদেব, পৃ. ৬৭
১৬. তদেব, পৃ. ৬৪
১৭. তদেব, পৃ. ৭১
১৮. তদেব, পৃ. ৭১
১৯. দেবী, মহাশ্বেতা, মার্চ, ২০১৯, শ্রেষ্ঠগল্প, সংরক্ষণ, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, দেজ, পৃ. ২৬০
২০. তদেব, পৃ. ২৬০
২১. তদেব, পৃ. ২৬৪
২২. তদেব, পৃ. ২৬৬